# ঐতিহ্যের সংঘাত

সালাহ্উদ্দিন আহ্মেদ



ঊনবিংশ শতক ও তৎপরবর্তী কালে বাঙালি মুসলিম সমাজ ভাবনায় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সংঘাত

পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক বিকাশকে রেনেসাঁস বা পূনর্জন্ম আখ্যা দেওয়া খানিক পরিমাণে বিভ্রান্তিকর, ক
ারণ অতীতের পুনদ্ধার সম্ভব নয়। বস্তুত, ইতিহাসে পুনর্জ্জীবনের স্থান নেই। অতীত থেকে প্রেরণা পাওয়া যায়, শিক্ষা গ্রহণ করা যায়,কিন্তু তার পুনর্জন্ম ঘটানো সম্ভব নয়। পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলস্বরূপ প্রাচীন গ্রীক-রোমান সভ্যতার পুনর্জ্জীবন ঘটেনি; ইয়োরোপীয় ইতিহাসের সভ্যতার সমাপ্তি এবং আমরা যাকে আধুনিক সভ্যতা বলি তার আরম্ভএ সূচিত করে।
আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণ হল মানবতাবাদ, ইহজাগতিকতা ও গণতন্ত্র। এদের উৎস খুঁজতে গেলে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কথা ভাবতে হয় যার স্ফুরণ হয়েছিল সক্রেটিশ, প্ল্যাটো ও অ্যারিস্টোটালের কালে। পঞ্চদশ শতকে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া রেনেসাঁস আন্দোলনের সঙ্গে শু হয়েছিল তা অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে তিনটি বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে। এগুলি হল (১) বৌদ্ধিক বিপ্লব, (২) শিল্প বিপ্লব বা অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং (৩) ফরাসি বিপ্লব বা বুর্জোয়া বিপ্লব। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তি স্থাপিত হয়।
এই প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান করা সমীচীন কীভাবে বাঙালি মানস, বিশেষত বাঙালি মুসলিম মানস, রেনেসাঁসের ভাবাদর্শ দ্ব
ারাপ্রভাবিত হয়েছে। এখানে আমরা বাঙালি মুসলমান সমাজকে আলোচনার লক্ষ্য বস্তু হিসাবে নিচ্ছি এ - কারণে যে গত শতকের শেষ দশকগুলিতে এ-বিষয়ে প্রধানত হিন্দু পণ্ডিত জনেরা অনেক গবেষণা করেছেন, অনেক নিবন্ধ লিখেছেন।
আমরা জানি যে ঊনবিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে ইংরেজি শিক্ষার অভিঘাতে এবং সমকালীন ইয়োরোপীয় উদ
ারনৈতিক ধ্যানধারণা প্রভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজে যে বিরাট বৌদ্ধিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তা-ই ‘বাংলার রেনেসঁ
াস’ আখ্যা লাভ করে।এই আন্দোলনের প্রবক্তারা ছিলেন উত্থানশীল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনুষ এবং হিন্দু সমাজে সংস্ক
ার ও পরিবর্তনের প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন।
সাধারণত এটা ধরে নেওয়া হয় যে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগের এই রেনেসাঁস বাঙালি হিন্দু বৌদ্ধিক জগতে গভীর অ
ালোড়ন আনলেও সমকালীন মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে বিশেষ অংশ নেন নি, কারণ তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, পশ্চ
াদ্মুখী এবং আধুনিকতা বিরোধী। মুসলিম রক্ষণশীলতা সম্পর্কে এই ধারণার প্রধান উৎস উইলিয়াম হান্টারের বই The Indian Mussalmans (১৮৭১-এ প্রকাশিত) সেই ইংরেজ সিভিলিয়ান তাঁর বইতে মুসলিমদের অবস্থাটাকে সহ
ানুভূতির সঙ্গে দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে-সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ছিল মুসলিম সমর্থন লাভ করা। বল
া হয়ে থাকে যে হান্টার বইটি তাড়াহুড়ো করে, মাত্র কয়েকসপ্তাহ সময় নিয়ে লিখেছিলেন। তাঁর বইতে হান্টার মুসলিম অবনতির কারণ দিতে গিয়ে কিছু একপেশে উক্তি করেছেন যেগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলে পরবর্তীকালে প্রতিপন্ন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, হান্টার লিখেছিলেন ১৭৯৩ - এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তৎপরবর্তীকালের ইস্ট ইন্ডিয়া কো
ম্পানির রাজস্বনীতির ফল স্বরূপ, বাংলার মুসলিম জমিদাররা নাকি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এটা কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য নয়।

বস্তুত নবাব মুর্শিদ কুলি খান (১৭০০-১৭২৭)-এর সময় থেকে, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই, বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলিম জমিদারদের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল এমন বলাটা ঠিক নয়।

হিন্দুদের তুলনায় মুসলিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খানিকটা দুর্বল। অতীতে মুসলিমরা যে - অধিপত্য দেখিয়েছে তার ভিত্তি ছিল মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই কর্তৃত্বের অবসান হল। যে - কর্তৃত্বের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ভেঙে পড়ার ফলে মুসলিমদের অবস্থার সাধারণ অবনতি ঘটে। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের অবনতির কারণস্বরূপ হান্টারের একপেশে বক্তব্যকে অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েই, বিশেষত মুসলিম নেতা ও পণ্ডিতজনেরা, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের অবনতির কারণ হিসাবে ব্রিটিশ ও হিন্দুদের দায়ী করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তখন থেকেই ইতিহাসে প্রতি এই নঞর্থক ও অগভীর দৃষ্টিভঙ্গী মুসলিম ভাবনাকে অধিকার করে আছে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা শুধু বিদেশি আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা নয়; তা পশ্চিমী সভ্যতার সান্নিধ্যে নিয়ে এল এই অঞ্চলকে। ব্রিটিশ শাসন ও পশ্চিমী অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় নি এবংএই ব্যবধান দুটি সম্প্রদায়ের পরবর্তী বিকাশকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুরা যেখানে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকে সাধারণভাবে স্বাগত জানিয়েছে মুসলিমরা সেখানে একে দেখেছে দুর্দৈব হিসাবে। বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং তদনুসারে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মুসলিমদের অক্ষমতা তাদের সমূহ ক্ষতি করেছে। এ থেকে উদ্ধার লাভে তাদের দীর্ঘ সময় লেগেছে।

ঊনবিংশ শতকে বাংলার মুসলিমদের পশ্চাৎপরতার আসল কারণ তাদের নেতৃস্থানীয়রা এক সঙ্কট ও প্রতিকূলতার মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছেন। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সাধারণভাবে পূর্বগানুকারী। সমকালীন এক নিরীক্ষকের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়, ''একপ্রাচীন বিজয়ী জাতি সহজে তার সুসময়ের স্মৃতি ত্যাগ করতে পারে না।''১ এমন উপলব্ধি কোনো সম্প্রদায়ের প্রগতির সহায়ক হতেপারে না। ''বস্তুত আধুনিক ভাবনার সঙ্গে মিলন সাধনে ব্যর্থতার কারণে''২ মুসলিমরা এক সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার শিকার হল --- এটাই শেষে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আবির্ভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে।

প্রত্যুত, হিন্দুদের ছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং নতুন শাসকদের ভাষা আয়ত্ত করার কাজে বিপুল আগ্রহ দেখিয়েছে। কলকাতার হিন্দু নেতাদের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল হিন্দুদের মধ্যে পশ্চিমী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে। এই প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে সমকালীন পশ্চিমী ভাবধারা সঞ্চারে বড় ভূমিকা নিয়েছে; এর ছাত্ররাই অনেকে সংস্কারপন্থী এবং মৌল পরিবর্তন পন্থী (র‍্যাডিক্যাল) আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। বস্তুত, ঊনবিংশ শতকের বাংলার হিন্দু সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে প্রভূত মাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও তার বিকাশে হিন্দুরা অতীব উৎসাহ দেখায়। নতুন শিল্প আন্দোলন শহরে আরম্ভ হলেও অচিরেই গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। শহরের উচচবর্গীয় হিন্দুদের ভাষা গৌণ প্রভেদ বাদ দিলে গ্রামের হিন্দুদেরও ভাষা হওয়ার কারণে মূল ভাবধারা বয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করেছে। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের বেলায় এটা ঘটেনি। শহরবাসী মুসলিম উচচবর্ণের ভাষা ছিল প্রধানত উর্দূ, ফলে তাদের সঙ্গে গ্রামের মুসলিম অধিবাসী যাদের ভাষা ছিল বাংলা সামান্যই মেলামেশা ছিল। বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক একবিভাজন রেখায় দ্বিখণ্ডিত ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশ এ - কারণে মন্থর হয়ে পড়েছিল।৩

পশ্চিমী অভিঘাত যে হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার কারণ বুঝতে চেষ্টা করতে হলে এই দুই মহান ধর্মীয় ব্যবস্থা, হিন্দুত্ব ও ইসলাম, এদের কিছু মৌল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবে। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত এবং এ পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগুলির অন্যতম। এ হল এক প্রশস্ত সাংস্কৃতিক স্রোত যার মধ্যে নানা ভাব,রীতি এবং পূজাপার্বণ স্থান পেয়েছে যেগুলি সামাজিক বিকাশের নানা স্তরের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। বাইরে থেকে উপাদান নিয়ে আত্তীকরণের অসীম ক্ষমতা আছে এর; হিন্দু সভ্যতা এভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্ণভেদ প্রথার প্রতিকূল প্রভাব এবং নানা কুসংস্কার ও বিধিনিষেধের প্রচল সত্ত্বেও চিরদিনই হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তায় বড় মাত্রায় নমনীয়তা ও উন্মুক্ততা বিদ্যমান। এর ফলে হিন্দু দার্শনিক ও সংস্কারকদের পক্ষে হিন্দু ধর্মকে যুগোপযোগী করে পুনর্ব্য

াখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। এখানেই রয়েছে হিন্দু ধর্মের শক্তি; এ - কারণে বাইরে থেকে নানা ঘাত - প্রতিঘাত এলেও হিন্দুধর্মের পক্ষে অটুট থাকা সম্ভব হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল তার ঐতিহাসিকতা। পূর্বকালের অন্য পয়গম্বর যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক কালে ছিলেন,যেমন কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র, মোজেস ও যীশু, তাঁদের মতো না হয়ে মোহম্মদ ছিলেন একান্তভাবেই ইতিহাসের ম ানুষ। ইসলাম অত্যন্ত সংগঠিত এক ধর্ম এবং এর ইতিহাস অনেকাংশেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ঐস্লামিক ধর্মীয় মত ও আচ ারাদি মানবজীবনের সমগ্র কালের --- শৈশব থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত -- জন্য এত স্পষ্ট করে বলা আছে, নির্দেশ করা আছে যে এর কোনো মুখ্য সংস্কার বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অবকাশ নেই। বস্তুত, গোঁড়া মুসলিম বিশ্বাস অনুস ারে কুর'আন ও সুন্নাহ্তে যে বিধি ও প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে সেসব চিরকালে গ্রাহ্য এবং অনমনীয় আর তাই ত াদের পরিবর্তন সম্ভব নয়। হয়তো বলা যায় যে এখানেই রয়েছিল ইসলামের শক্তি যেমন তেমনি তার গলদ।

কিন্তু আমরা যদি ইসলামের বৌদ্ধিক ইতিহাস পর্যালোচনা করি তা হলে দেখতে পাব যে ঐস্লামিক ধর্মীয় বিধানের গোঁড়া মিসত্ত্বেও মুসলিম সামাজিক ভাবনায় নানা ধারা কাজ করেছে যেগুলি মুসলিম সম্প্রদায়ের মন ও চরিত্রের উপর অনপনেয় চিহ্ রেখে গেছে। এই ধারাগুলিকে নিম্নলিখিত শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ (ক) গোঁড়া মৌলবাদী, (খ) আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী, (গ) রক্ষণশীল সংস্কারবাদী, (ঘ) আধুনিক সংস্কারবাদী এবং (ঙ) ইহজাগতিক যুক্তিবাদী।

(ক) গোঁড়া মৌলবাদী ঃ যাঁরা গোঁড়া বা মৌলবাদী ইসলামের প্রতিভূ তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে কুর'আন ও সুন্নাহ্- র নির্দেশ অন্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা সমগ্র মানবজাতির ঐক্যে বিশ্বাস করেন না। বস্তুত, গোঁড়া ইসলাম মানবজাতিকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করে ঃ (১) মুসলিম উম্মাহ্ অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসীরা এবং (২) অবিশ্বাসীরা অর্থাৎ মানবজাতির বাকি অংশ।৪ মৌলবাদীরা চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি এতই কঠোরভাবে আসক্ত যে তাঁদের বিবেচনায় যা সত্যিকারের ঐস্লামিক ব্যবস্থা তা প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম কাফেরদের বিদ্ধে যুদ্ধ (জেহাদ) ঘোষণাকে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। ইতিহাস আমাদের বলে যে যখনই মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির অবনতি ঘটেছে বা মুসলিম সমাজ বহিঃশত্রুর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে তখনই ঐস্লামিক মৌলবাদ শক্তি সঞ্চয় করেছে। আমরা যাকে ওয়াহাবি আন্দোলনে বলি তার উত্থান ঘটে যখন অষ্টাদশ শতকে পুরো আরবদেশ তুর্কী আধিপত্যে আসে এবং অটোমান শক্তি ক্ষীয়মান হতে শু করে। অনুরূপভাবে রায় বেরেলির সৈয়দ আহ্মদ ওয়াহাবি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরভারতে উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে তারিকা - ই- মুহ ম্মদিয়া আন্দোলন শুর করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মুসলিমদের অবনতির প্রধান কারণ পয়গম্বর মোহম্মদের প্রচারিত মূল ইসলাম থেকে বিচ্যুতি এবং অমুসলিমদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের পৃথক সত্তার প্রায় অবলুপ্তি। তাই তিনি মনে করতেন যে ইসলামেহ সংস্পর্শে এসে নিজেদের পৃথক সত্তার প্রায় অবলুপ্তি। তাই তিনি মনে করতেন যে ইসলামের গৌরব ফিরে পেতে হলে পয়গম্বর ও প্রথম চার আদর্শ খালিফা (খালিফা - ই - রাশেদীন)-দের সময়কার জীবনধারায় মুসলিমদের ফিরে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সৈয়দ আহ্মদ তাবিকা মোহম্মদিয়া (মোহম্মদের পথ) প্রবর্তন করেন। অমুসলিমদের দ্বার া শাসিত ভারতকে তখন দার - উল - হার্ব বা শত্রু- অধিকৃত অঞ্চল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সৈয়দ আহ্মদের আন্দে ালনের লক্ষ্য ছিল একে দার - উল - ইসলামে রূপান্তরিত করা, অর্থাৎ পুনরায় ঐস্লামিক শাসনাধীনে আনা। কিন্তু সৈয়দ আহ্মদ যখন বুঝতে পারলেন যে ভারত থেকে শক্তিধর ব্রিটিশদের উৎখাত করা খুবই দুরূহ কাজ, তখন তিনি ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) ঘোষণা করলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিখদের বিদ্ধে। শিখরা তখন উপমহাদেশের পাঞ্জাব ও উত্তর - পশ্চিম অঞ্চলের শাসনক্ষমতায় ছিল যেখানে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল মুসলিম। জানা গেছে যে বেশ কিছু বাঙালি মুসলিম তঁ ার এই জেহাদে শামিল হয়েছিল। সেই সময়ে পুরো অঞ্চলটি ছিল মহারাজ রণজিৎ সিংহের হাতে শিখ শাসনাধীন। ১৮৩১ সালে শিখদের বিদ্ধে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহ্মদ এবং তাঁর অনুগামীদের অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ আহ্মদের বেশ কিছু বাঙালি শিষ্য ছিলেন; এঁদের অন্যতম মীর নিশার আলি যাঁকে সাধারণত তিতুমীর নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এক গরীব চাষী পরিবারের মানুষ। জমিদারদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু ; ত াদের ও ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে অনেক গরীব চাষী ও তাঁতী তিতুমীরের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। জমিদার ও নীলকরদের বিদ্ধে কলকাতার অদূরবর্তী কিছু এলাকায় তারা পরপর আক্রমন চালায়। সৈয়দ আহ্মদের মতেই তিতুমীর

শাহাদত বরণ করেন ১৮৩১ সালে কোম্পানি ফৌজদের সঙ্গে বারাসতের নিকটবর্তী এক জায়গায় লড়াইয়ের পর।
পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আরও বিস্তৃতভাবে অনুরূপ আন্দোলনে শামিল হয়। এর সূচনা করেন হাজি শরিয়াতুল্লাহ্। তিনিও ছিলেন গরীব মানুষ। একে ফরাইজি আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়; কুর' আন - নির্দেশিত ঐস্লামিক রীতিনীতির পুনদ্ধার ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু অচিরেই এ - আন্দোলন এক কৃষি বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। এই ধর্মীয় - কৃষি আন্দোলনগুলি শেষে ব্যর্থ হয় এই কারণে যে এদের নেতৃত্বে ছিলেন এমন মানুষ যাঁরা 'অজ্ঞ ধর্মোম্মাদ'।৫ বস্তুত, এই পশ্চান্মুখী আন্দোলন শহরের শিক্ষিত উচচ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলিমদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। এমন কী গ্রামাঞ্চলের মুসলিমদের অধিকাংশও --- যাঁরা ধর্মীয় আচরণে গোঁড়া ছিলেন না এবং স্থূল সমন্বয়বাদী ও লোকাচার ভিত্তিক ইসলাম অনুসরণ করতেন --- তাঁরাও এই আন্দোলন শামিল হন নি।৬
এই মৌলবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ নেতারা সমকালীন পরিস্থিতির বাস্তব চরিত্রর অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ ভারতে যে জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল তা বিগত দিনের সরল ও অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে সমাধান করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, এই পশ্চান্মুখী মৌলবাদী ধর্মীয় আন্দোলন মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতিক্লেথ করে দিয়েছিল। এটা বললে খুব মিথ্যা বলা হবে না যে অ াজ আমরা যে ধরনের ঐস্লামিক জঙ্গী আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি তা ঊনবিংশ শতকের পুনজ্জীবনবাদী আন্দোলনেরই উত্তরসূরি।
(খ) আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী ঃ ঐস্লামিক মৌলবাদ থেকে ভিন্নতর সূফীবাদ ছিল ঐস্লামিক ভক্তিবাদ যার প্রবক্তা ছিলেন সূফীরা। এঁরা বিস্বাস করতেন যে ঈশ্বর যেহেতু সর্বাধিক কাণিক, সর্বাধিক দয়ালু (আর - রহ্মান - ইর্ - রহিমা) তিনি ভয় পাওয়ার বস্তু নন, ভালোবাসার বস্তু এবং তাই তাঁর সঙ্গে মানুষ মিলতে পারে শুধু প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে। সূফীরা এক প্রক ারের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে ঈশ্বাস করতেন। তাঁদের শিক্ষার কেন্দ্রিক বিষয়কে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ (ক) ঈশ্বরের অনন্যতা (ওয়াহাদুল - আল - ওয়াদুদ); (খ) পূজার বহিঃপ্রকার ও আচারাদির অর্থহীনতা; (গ) মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি এবং ঈশ্বরের প্রতি পরম ভক্তি।বস্তুত সূফী ভাবনায় সারকথা অনেকাংশে হিন্দু ভক্তিবাদের অনুরূপ। সূফীদের ধ্যানধারণা ও আচারাদি এতই বিচিত্র যে তাঁদের কোনো একটি মাত্র বর্গে স্থাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কালত্রমে তাঁরা একাধিক সম্প্রদায় বা তারিকা-য় বিভক্ত হলেন। পি.কে. হিট্টির মতে, "ইসলামের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র ব াগদাদ সূফীদের আদিতম সম্প্রদায়কে লালন করেছে এবং এক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করেছে যেখান থেকে তারা সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। এই স্থান - কাল থেকেই বিজয়ী সুফীবাদ পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভে অগ্রসরহয়। ইসলামের এক লোকায়ত রূপ হয়ে দাঁড়াল এটি।"৭ প্রকৃতপক্ষে এক বৈশ্বিক ধর্ম হিসাবে ইসলামের প্রসারে প্রথাবিরোধী সুফীরা সবচেয়ে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ কথাটা বিশেষভাবে খাটে, যেখানে উদারপন্থী সূফী সন্ত, পীর - ফকির, আউল - বাউল এবং দরবেশদের কাজকর্ম মৌলবাদী মোল্লাহ্দের তুলনায় ইসলামের প্রসার সাধনে অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে।যে ধর্মীয় ঐতিহ্য এই সূফী সন্তরা সৃষ্টি করেছিলেন তা হল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ ও সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য যা বাঙালি মানসে ও চরিত্রে চিরস্থায়ী অভিঘাত রেখে গেছে এবং সমন্বয়বাদী ও মানবতাবাদী বাঙালি সংস্কৃতির সৃজনে সহায়ক হয়েছে।৮
(গ) রক্ষণশীল সংস্কার পন্থী ঃ ঊনবিংশ শতকের পরের দিকে, বিশেষত ১৮৫৭ সালের বিরাট ব্রিটিশ - বিরোধী বিদ্রোহ (যাকে 'মিউটিনি' বলা হয়) তার পর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। সম্প্রদায়ের গুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে এ-উপলব্ধি দেখা দেয় যে তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে মুসলিমদের উচিত পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করা এবং ইংরেজি শেখা। তৎকালীন বাংলার প্রধানতম মুসলিম নেতা আব্দুল লতিফ (১৮২৪ - ১৮৯৩) এই অভিমত সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে ব্যত্ত করেন। যদিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি প্রশাসনে অপেক্ষাকৃত নিম্নতম পদে ছিলেন, তিনি অনেকখানি প্রভাব ঘটাতে পেরেছিলেন। ভারতের মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার কল্পে যে মুসলিম নেতারা আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছিলেন তিনিই ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম। আব্দুল লতিফের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু ছিল রক্ষণশীল। গোঁড়া মুসলিম মতের প্রবল বিরোধিতা না করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে যুক্তি ওআপোষের ত্রমিক পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাই যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার বাস্তব উপযোগিতার কথা মনে রেখে তিনি তার প্রসারে আগ্রহী

ছিলেন, পশ্চিমী উদারনৈতিক ভাবধারা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। এর ফলে অবশ্য একটা অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। ইয়োরোপীয় এক ভাষা আয়ত্ত করবে কিন্তু যে-ভাষা যে - ভাব বহন করে তা উপেক্ষা করবে কারও পক্ষে এটা কেমন ভাবে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে সমকালীন পশ্চিমী উদারনৈতিক ভাবধারা নিশ্চিতভাবে উত্থানশীল, ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম তণ সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছিল এবং মুসলিম রক্ষণশীলতাকে দুর্বল করেছিল। এই সম্ভ াবনা আব্দুল লতিফের খুবই অপছন্দ ছিল।এদিক থেকে তাঁকে ঊনবিংশ শতকের অন্য এক বাঙালি শিক্ষার বিস্তার সাধনে যিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু গোঁড়ামিরছিলেন কট্টর সমর্থক। আবদুল লতিফের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল। তাঁর সমকালীন উত্তরভারতীয় মহান সয়ীদ আহ্মদ খান(১৮১৭-১৮৯৮)- এর প্রতিরূপে তিনি মুসলিম সংস্ক ার ও গোঁড়ামির সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাইছিলেন তাদের বিদ্ধতা না করে। একজনউদারনৈতিক ব্রিটিশ সাংবাদিক ডব্লু. এস. ব্লান্টের মতে (ইনি ১৮৮৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন) আবদুল লতিফ "প্রাচীনপন্থী মুসলিমদের" নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সৈয়দ আমীর আলি ও তাঁর বন্ধুদের তিত্ত সমালোচনা করেন এই কারণে যে "তাঁরা ইংরেজি পোষাকও আচ ারাদি গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের সংস্কারক বলে দেখাতে চাইতেন।"৯ অ াবদুল লতিফ বিশ্বাস করতেন যে "সংস্কারের সূচনা করবেন ধার্মিক মানুষরা, অধার্মিকরা নন; অন্যথা এ- সংস্কারের কোনো প্রভাব পড়বে না জনগণের ওপর।"১০ তিনি ছিলেন পরম্পরাশ্রয়ী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বড় সমর্থক এবং আমীর আলি ও তাঁর বন্ধুদের যে প্রয়াস ছিল একে ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে প্রতিস্থাপনের তার বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রধান অ াবদুল লতিফের প্রভাবেই বাংলায় দুটি সমান্তরালশিক্ষা ব্যবস্থা, একটি সাধারণ ও অন্যটি মাদ্রাসা ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী রূপ গ্রহণ করে।

(ঘ) আধুনিক সংস্কারপন্থী ঃ- ঊনবিংশ শতকের মুসলিম ভাবধারার আধুনিক সংস্কারপন্থী দিকটি ব্যক্ত হয়েছে দু'জন অসাম ান্য মুসলিম চিন্তকে ভাবধারা ও কাজকর্মে। এঁরা হলেন উত্তর ভারতের সয়ীদ আহ্মদ খান (১৮১৭-১৮৯০) এবং বাংল ার সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৭ - ১৯২৮)। সমকালীন প্রতিকূলতার আলোকে তাঁরা ইসলামের পুনর্ব্যাখা করতে চেয়েছেন। যে-যুগে বিজ্ঞানের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছে এবং উদারনৈতিক ভাবনার প্রসার ঘটেছে, সে সময়ে এটা প্রমাণ কর া প্রয়োজন ছিল যে ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রগতিরবিরোধী নয়। সয়ীদ আহ্মদ খান, যিনি ভারতে মুসলিম রেনেসাঁসের জনক বলে স্বীকৃত কুর'আন-এর উপর তাঁর বিখ্যাত ভাষ্যে গ্রন্থটির একটি যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরের বাণী (কুর'আন) এবং ঈশ্বরের কৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকার প্রয়োজন নেই। রামমে াহন রায়ের মতো সয়ীদ আহ্মদ খান বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় মত যুক্তি দিয়ে ওসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে এবং সমকালীন জ্ঞান ও প্রয়োজনের নিরিখে তাদের পুনর্মূল্যায়ন সমীচীন।

সয়ীদ আহ্মদ খানের সমকালীন অনুজ সৈয়দ আমীর আলি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে উনিশ শতকের উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী প্রাণসত্তার আলোকে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমীর আলি সয়ীদ অ াহ্মদের থেকে এক পা এগিয়ে গেছেন। ডব্লু. সি. স্মিথ যেমন বলেছেন, "স্যার সয়ীদের মত ছিল যে ইসলাম উদার প্রগতির পরিপন্থী ছিল না। আর আমীর আলি যে ইসলামকে উপস্থিত করলেন তা প্রগতিরই নামান্তর।"১২ আমীর আ লি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিমদের উচিত আপন বিচারবুদ্ধি (ইৎজিহাদ) প্রয়োগ করা এবং ইসলামকে ব্যাখ্যা করা অ াধুনিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের আলোকে, "যে মানুষরা নবম শতকে বেঁচে ছিলেন তাঁদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে।"১৩ আমীর আলি দ্বিধাহীনভাবে ইসলামের গোঁড়া বা মৌলবাদী ব্যাখ্যাকে বর্জন করেছেন। তিনি এই চমকপ্রদ ও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ

পশ্চিম বিশ্ব রেনেসাঁস রিফর্ম্যাশিন নিয়ে এসেছিল এবং ইয়োরোপ যখন পুরোহিততন্ত্রের শৃঙ্খল ছুঁড়েফেলে তখনই তার প্রগতি শু হয়। ইসলামের বেলাতেও সংস্কারের পূর্বে আলোকপর্ব আসতে হবে, এবং ধর্মীয়জীবনের নবীভবনের আগে বহু শতকের আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং 'প্রথানুগতার' নিয়ম মনের উপর যে বন্ধন আরোপ করে আছে তা থেকে প্রথমে তার মুক্তি আবশ্যক। যে অনুষ্ঠানিকতা পূজকের হৃদয় আকর্ষণ করে না তা পরিত্যাগ করতে হবে, বাহ্যিক আচার আন্তরের অনুভূতির অধীন হবে; নমনীয় মনের উপর নীতিশাস্ত্র পাঠের ছাপ পড়তে হবে; শুধু তখনই আমরা ইসলামের পয়গম্বরের শেখানো কর্তব্যের নীতিগুলি সম্পর্কে উৎসাহবোধ আশা করতে পারি। ইসলামের সংস্কার আরম্ভ হবে যখন এটা বোঝা য

াবে যে ঈশ্বরের বাণী যে ভাষায়ই অনুবাদ করা হোকনা কেন তাদের দৈব চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত অঞ্জলি যে কোনো ভাষায় উচচারিত হোক না কেন ঈশ্বর তা গ্রহণ করবেন.....।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে একটা সহমত ছিল যে অর্থ না বুঝে ভক্তি নিবেদন করলে তা বৃথা যাবে। ইমাম আবু হানিফা নাম াজ পাঠ এবং খুত্বা বা উপদেশ পাঠ যে কোনো ভাষায় বিধিসম্মত ও গ্রাহ্য বিবেচনা করতেন। আবু হানিফার শিষ্য, আবু ইউসুফ ও মোহম্মদ, একটু পরিবর্তন সহ তাঁদের গুর মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন।তাঁরা বলে গেছেন যে - ব্যক্তি আরবি ভাষা জানে না, সে অন্য যে - কোনো ভাষায় তার ভক্তি নিবেদন করতে পারে।১৪

আমীর আলি প্রথাসিদ্ধ মাদ্রাসা শিক্ষা পছন্দ করতেন না, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এ ছিল সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী এবং কে ানো কাজে লাগত না। তিনি তাই এর অবসান চেয়েছিলেন, মত দিয়েছিলেন যে সম্পূর্ণ প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলির পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা ব্যয় করা উচিত ''উচচ ইংরেজি ও কারিগরি শিক্ষার''১৫ পেছনে। সম্পূর্ণত প্রাচ্য শিক্ষাদনের জন্য প্রতিষ্ঠান চালনা ''সরকারের পক্ষে অবিবেচক কাজ, কারণ এ মানুষের মধ্যে পুরাতন বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সঞ্চার করে।১৬ উনিশ ও বিশ শতকের ইংরেজি - শিক্ষিত মুসলিমদের মনে এরূপ আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারা গভীর প্রভ াব ফেলেছিল।

(ঙ) ইহজাগতিক যুক্তিবাদী ঃ- ইস্লামিক ধর্মীয় অনুশাসনে যদিও বিশেষ নময়ীয়তা নেই, তবু মুসলিম চিন্তাধারায় যুক্তিশীলতার একটা উপাদান বরাবরই বিদ্যমান ছিল। এই ধারার আদিতম প্রকাশ দেখা গেছে আরবের নবম ও দশম শতকের মূতা - জিলা মতাদর্শের মধ্যে মূতা - জিলা দার্শনিকরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রাচীন গ্রীক যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা--- বিশেষত অ্যারিস্টোটলীয় ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা --- এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে কীভাবে যুক্তির সঙ্গে মেলানো যাবে এই যুগপ্রাচীন উভয় সঙ্কটের সমাধান খুঁজেছেন। কিন্তুগোঁড়ায় ইসলামের প্রবক্তাদের দিক থেকে প্রবল বিরোধিতায় এই স াহসিক প্রয়াস সফল হয় নি। কিন্তু এটি একেবারে লুপ্ত হয়নি এবং ঐস্লামিক বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে রইল। উনিশ শতকের ভারতের উদারনৈতিক পরিমণ্ডলে এই যুক্তিবাদী ধারা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। এভাবে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে আমরা একজন উল্লেখ্য মুসলিম র‍্যাডিক্যাল চিন্তকের কথা জানতে পারি, তিনি আবদুল রহিম।১৭

আবদুল রহিমের জন্ম ১৭৮৫ -র কাছাকাছি সময়ে (হিজরী ১২০০ অব্দে) উত্তর ভারতের গোরখপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন পেশায় তন্তুবায়। ছেলেবেলায় রহিম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান; সে কারণে তাঁর বাঁ হাত অবশ হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁর জীবনধারা পাল্টে যায়। যেহেতু পারিবারিক পেশা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তিনি ভালো করে লেখাপড়া করার দিকে মন দিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লির বিখ্যাত কয়েকটি মাদ্রাসায় পাঠ গ্রহণ করেন এবং অচিরে ঐতিহ্যাশ্রয়ী ঐস্লামিক বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলে খ্যাত হন। আরবি ও ফারসির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্ বন্ধে প্রভূত জ্ঞানাহরণ করেন। শুধু উচচতর ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিই নয়, তৎকালে প্রাপ্তব্য আরবি ও ফারসি ভাষা দর্শন ও বিজ্ঞানের পুরাণ গ্রন্থগুলিও তিনি পাঠ করেন। তিনি বিশেষ করে মূতা - জিলা-র যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষে সকল ধর্মে তিনি বিশ্বাস হারান। বস্তুত, যে আবদুল রহিম তণ বয়সে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন তিনি মুক্তমনা ও যুক্তিব াদীতে পরিণত হলেন। তাঁর ধর্মবিরোধী মতের কারণে তিনি দহ্রি বলে খ্যাত হলেন, অর্থাৎ এসব মানুষ যিনি পয়গম্বর ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করেন না। আবদুল রহিমের মতে ভগবান্ বা পরম সত্তার ধারণা ইমাম বা পুরোহিতদের মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির বিধানে। তাঁর মতে সূর্যই হল সকল সৃষ্টির উৎস।

১৮১০ সালে আবদুল রহিম কলকাতায় চলে আসেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই কাটান। কলকাতায় তিনি স্ব গৃহে রয়েছেন এমন মনে করতেন, কারণ এই নগরে, নতুন ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি এই বহুজাতিক মহানগরে বহুমতের নান া রকমের মানুষ আকৃষ্ট হত। এ - শহর অ-সাধারণ ও ধর্মদ্রোহী মানুষদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। জানা যায় যে সয়ীদ আহ্মদ দিল্লিতে আবদুল রহিমের সহপাঠী ছিলেন। তিনি ১৮২০ সালে কলকাতায় এসে আবদুল রহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন --- উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বুঝিয়ে ইসলামের চৌহদ্দিতে ফিরিতে আনতে। কিন্তু আবদুল রহিম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, তাঁর ধর্মদ্রোহও বর্জন করেন নি।১৮

মৌলানা এবাইদ ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন দশ বছর। তাঁর উদ্যোগেই ১৮৭৩ সালে ঢাকা সমাজ সম্মেলনী

প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল সমাজসংস্কার কল্পে স্থাপিত সাধারণের সমিতি। ওবাইদ আবার ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মেলন, Calcutta Muhammedan Literary Society এবং Bengal Social Science Association --- এদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা নেতা রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ওবাইদের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। তাঁর অনুরোধে মৌলানা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত পুস্তক তুহ্ফাতুল - মুইয়াহিদিন --- যা লেখা ছিল ফারসিতে, আরবি ভূমিকা ও শিরোনাম হসহ --- ইংরাজিতে অনুবাদ করেন।

আবদুল রলিম দহ্রির মৃত্যুর পর মুসলিম ভাবনার যুক্তিবাদী ধারাটি লুপ্ত হয়নি। মুসলিম বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের উপর এর খানিকটা ক্ষীণ প্রভাব এরপরও অক্ষুণ্ণ থাকে। উনিশ শতকের শেষে আমরা এর দৃঢ় প্রভাব লক্ষ করি দেলওয়ার হোসেন আহ্মদের (১৮৪০-১৯১৭) রচনায়। তাঁকে সঠিক অর্থে রেনেসাঁস ব্যক্তিত্ব হিসাবে বর্ণনা করা যায়। দেলওয়ার হোসেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় একমধ্যবিত্ত পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৬১ সালে প্রথম বিভাগ বি. এ. পাশ করেন। খুব সম্ভবত তিনি ভারতের প্রথম মুসলিম স্নাতক। দেলওয়ার হোসেন ছিলেন সাহসী ও মৌল চিন্তক এবং মুসলিম সমাজের বিধি - বিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলির আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৮৯ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বই Essays on Muhammedan ত্রন্তুন্তুন্ত্রপ্ত ত্মন্দ্বন্দ্রপ্সজপ্প -এ দেলওয়ার হোসেন স্পষ্ট ভাষায় তাঁর ভাবধারা ব্যক্ত করেন। সমকালীন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দর্শন দ্বারাতিনি অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেলওয়ার হোসেন সম্ভবত প্রথম মুসলিম বুদ্ধিজীবী যিনি স্পষ্টভাবে লেখার সাহস দেখিয়েছেন যে ইহবাদী বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এক পরিবর্তনশীল সমাজের বৈষয়িক প্রয়োজনগুলি কোনো স্থবির ধর্মীয় বিধান মেটাতে সক্ষম নয়। তাঁর অভিমত ছিল যে মুসলিমদের প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণতাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ধর্মের প্রবল প্রভাব; পক্ষান্তরে ইয়োরোপীয় দেশগুলির অগ্রগতি হয়েছে এই কারণে যেতারা ধর্মকে রাজনৈতিক ও নাগরিক বিধান থেকে ক্রমশ দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। দেলওয়ার হোসেনের ভাষায় ঃ

...পৃথিবীর প্রতি অংশে সামাজিক রীতি ও নাগরিক বিধানের সঙ্গে ধর্মের মিলনে মুসলমানদের পক্ষে সর্বাধিক অনিষ্ট সাধিত হয়েছে, এবং শীঘ্র ও সময়মতো এদের বিচ্ছিন্ন না করলে মুসলমান শব্দটি কথার -কথা দাঁড়াবে এবং সভ্য জাতিগুলির মধ্যে মুসলিম নরগোষ্ঠীগুলি পরিহাসের বস্তুতে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।২০

দেলওয়ার হোসেনের মতে মুসলিমদের অবনতির কারণ তাদের সঙ্কীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা। অধিকাংশ মুসলিম দেশে স্বৈরাচারী শাসনের প্রচলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন এটা হয়েছে আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বনের অভাবের কারণে। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন ঃ

কোনো মুসলিম জাতিই কখনও রাজাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় নি। সবচেয়ে অগ্রসর খৃস্টান দেশগুলিতে সার্বভৌমের ক্ষমতা--- তাঁর নাম সম্রাট, রাজা বা রাষ্ট্রপতি যা-ই হোক না কেন --- কম - বেশি মাত্রায় আইনের শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ; কিন্তু মুসলিম দেশগুলিতে সার্বভৌম আইনের ঊর্ধের্ব এবং তিনি কী করতে চান বা না চান তার জন্য কারও কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা নেই।২১

প্রকৃতপক্ষে দেলওয়ার হোসেন ছিলেন ইহবাদিতার পরম সমর্থক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের মিলনে মুসলিমদের নিদাণ ক্ষতি হয়েছে। আবার তাঁর মতে মুসলিমরা আধুনিককালে বিশেষ অবদান রাখতে পারে নি মুসলিম সমাজে বৌদ্ধিক স্বাধীনতার অভাববশত।

দেলওয়ার হোসেন যদিও উচ্চবর্ণের সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে এসেছিলেন তিনি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে মুসলিমসমাজের সাধারণ উন্নতির জন্য শহুরে ভদ্রোলোক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের অভাবটা পূর্ণ করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমেই এটা করা যাবে। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে অগ্রগতি আনতে হলে মুসলিমদের একই সঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাই শিখতে হবে। আমীর আলির মতো তিনিও মাদ্রাসাতে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত তার প্রবল বিরোধী ছিলেন। তিনি এগুলি তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বলেছিলেন এদের পরিবর্তে কলকাতা ও অন্য শহরগুলিতে নতুন কলেজ স্থাপিত হোক যেখান ইংরেজি ও অন্য আধুনিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে। দেলওয়ার হোসেনের মতে, মাদ্রাসায় যে শিক্ষা দেওয়া হত তাছিল ‘‘সম্পূর্ণত কালের অনুপযোগী এবং

যার বর্তমান মূল্য নেই, ভবিষ্যতেই যার ব্যবহার হবে না, লোককে এমন কিছু দেওয়া সম্পদের অপচয় মাত্র।"২২
বাংলা ভাষা শিখতে এগিয়ে আসার জন্য দেলওয়ার হোসেন মুসলিমদের আহ্বান জানান। তিনি দেখালেন যে উচচবর্ণের দ্বারা বাংলা ভাষার অবজ্ঞার ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। শহুরে উচচবর্গ ও গ্রামীণ নিরক্ষর জনগণের মধ্যে ব্যবধান এভাবে বেড়ে গিয়েছিল। হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলার মুসলিমদের উর্দূকে বাদ দিয়ে বাংলাকেই প্রথমভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।২৩ তিনি ভেবেছিলেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শুধু সাধারণ মানুষ আধুনিক জ্ঞান - বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে, কারণ সকলের পক্ষে ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। তাই তাঁর সুপারিশ ছিল যে - দেশবাসী ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাঁরা বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের মৌল গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদের দায়িত্ব নিন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই প্রক্রিয়াতেই পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ধ্যান - ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত করা যাবে।২৪
সমাজ সংস্কারেও দেলওয়ার সংস্কারেও দেলওয়ার হোসেন গভীর আগ্রহ দেখান। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন যা সম্পত্তির অধিকারীকে আপন সম্পত্তি বিক্রির বা ইচছামতো উত্তরাধিকারীকে দানে বাধা দেয় তিনি তার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের অনুরূপ এক ইহবাদী আইন দিয়ে তার প্রতিস্থাপন চেয়েছিলেন।২৫ তিনি মহিলাদের অন্তঃপুরে রাখা (পর্দাপ্রথা) ও বহুবিবাহ প্রথারও ঘোর বিরোধী ছিলেন।
বাংলার অপর দুই মুসলিম নেতা, আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলির তুলনায় দেলওয়ার হোসেনের ধ্যান - ধারণা ছিল অনেকখানি অগ্রসর এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা জানি আবদুল লতিফ মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চাইছিলেন স্রেফ বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে। কিন্তু তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তিনি মুসলিমদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের সঙ্গে আপোষ করতে চেয়েছিলেন, তাদের অতিক্রম করা নয়। তাঁর পীড়াপীড়িতেই পুরোনো আমলের মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলায় চলতে লাগল, যদিও তাঁর দুই সমকালীন সৈয়দ আমীর আলি ও দেলওয়ার হোসেন এর প্রতিস্থাপন করে যুগের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। আবদুল লতিফের তুলনায় আমীর আলির মতামত ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও প্রগতিশীল। আমরা আগেই আমীর আলির সংস্কারমূলক ধর্মীয় অভিমতের কথা বলেছি, সমকালীন পশ্চিমী যুক্তিবাদী ভাবনার আলোকে ইসলামের পুনর্ব্যাখার আহ্বানের কথা বলেছি। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ও সঠিক ভাষায় বলে যান নি, হয়তো বলতে সাহস পান নি, ইসলামের কোন্ বিধি ও আচার সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন বা বর্জনের প্রয়োজন ছিল।
তুলনামূলকভাবে দেলওয়ার হোসেনের ভাবনা - চিন্তা ছিল স্পষ্টতর এবং পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতাসঞ্জাত। সেসব ছিল র‍্যাডিক্যাল এবং খানিকটা বৈপ্লবিক। দেলওয়ার হোসেন বোধ হয় ছিলেন প্রথম মুসলিম চিন্তক যিনি শুদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠান ও আচারাদি পরিবর্তন বা বর্জনের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সময়ের সঙ্গেসঙ্গতি রাখতে গেলে এর প্রয়োজন ছিল। তিনি দেখিয়ে গেছেন যে তাদের জন্য অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার স্থাপন করলে বা ননানা সরকারি চাররিতে অধিকতর সংখ্যায় তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করলেই মুসলিমদের পশ্চাৎপরতা দূর করা যাবে না। তাঁর বিশ্বাস ছিল মুসলিমদের উন্নতির প্রথম শর্ত হল সেই সব প্রতিষ্ঠান ও আচারাদির পরিবর্তন বা বিলোপসাধন যেগুলি অগ্রগতির পথে অন্তরায়স্বরূপ বলেছেন ঃ
মুসমলানদের জন্য আমরা অধিকতর সংখায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারি, অথবা তাদের কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ বানাতে পারি কিন্তু আমরা সামূহিকভাবে তাদের গুত্ব বাড়াতে সক্ষম হব না যদি ভারতের মুসলমানরা তাদের পশ্চাৎপরতার আসল কারণ উপেক্ষা করে অথবা তাদের বিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধনে গা - জোয়ারি অপারগতা দেখায়। ২৬
এটা আশ্চর্যের নয় যে দেলওয়ার হোসেনের র‍্যাডিক্যাল মত সমকালীন মুসলিম সমাজের পছন্দ হয় নি, কারণ সে - সমাজ মূলত রক্ষণশীল রয়ে গিয়েছিল। আবার যেহেতু দেলওয়ার হোসেন সম্পূর্ণত ইংরেজিতে লিখতেন, তাই তাঁর ভাবধারা সাধারণ জনের কাছে পৌঁছতে পারে নি। এতৎসত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে তাঁর ভাবনায় ভবিষ্যতের জন্য বৈপ্লবিক সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু'বছর আগে দেলওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন যার মধ্যে তাঁর প্রত্যয়ের সাহসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখলেন ঃ

বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী যে কোনো মানুষের কর্তব্য হল সত্যের অন্বেষণ এবং যখন তা পাওয়া গেল সে কথাটা ঘোষণা করা। আমি সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে তা তুলে দিতে অমি দায়বদ্ধ।২৭

আবদুল রহিম দহ্‌রি, সৈয়দ আমীর আলি ও দেওয়ার হোসেনের যুক্তিবাদী, সংস্কারপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল ভাবধারা পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ সাধনের জন্য তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

বিংশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন এসেছিল। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নাম্নী এক সাহসিকা মহিলা (১৮৮০ - ১৯৩২) নারীমুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অগ্রগতির অপরিহার্য প্রাক্‌শর্ত হল শিক্ষা। তাই ১৯১১ সালে সামান্য সম্পদ্‌ নিয়ে মেয়েদের জন্য কলকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন (পরে এর নাম হয় সাখাওয়াৎ স্মারক বালিকা বিদ্যালয়)। স্কুল টি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মেয়েদের মধ্যে উপযোগী শিক্ষার বিস্তার সাধন। মুসলিম নারীদের পশ্চাৎপদ করে রেখেছিল তাদের বিরোধিতা জ্ঞাপন। তাঁর সময়কার পুষ - শাসিত মুসলিম সমাজে নারীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ করা হত রোকেয়া তার বিদ্ধে জোরাল প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের নিম্নতর অবস্থার জন্য সামাজিক পরিস্থিতিই দায়ী, কোনো অন্তর্নিহিত ত্রুটি নয়। তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারীদের দুরবস্থার নিন্দা করে তিনি তিক্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করছেন ঃ

আমরা কি সত্যি বিশ শতকে বাস করছি? পৃথিবী থেতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছে এমন বলা হয়, কিন্তু আমাদের দাসত্ব কি লুপ্ত হয়েছে? ---না।২৮

বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে পুষরা যেসব বিধান তৈরি করেছে যে সবই নারীদের হীনাবস্থার জন্য দায়ী। যিনি দেখালেন যে পুষরা চিরদিনই নারীদের নিম্নতর মানুষ হিসাবে গণ্য করেছে। নারীদের নিম্নাবস্থায় রাখার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান দায়ী বলে তিনি বিশ্বাস করতেন সেসবের তিনি সমালোচনা করেছেন। যে সকল কারণে নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে সেসববিশ্লেষণ করে রোকেয়া একটি সাহসিক ও স্পষ্ট মন্তব্য রেখেছেন ঃ

আমরা যে আমাদের দাসত্বের বিদ্ধে দাঁড়াতে পারি না তার প্রধান কারণ হল যখনই কোনো নারী মাথা তুলতে চেয়েছে সে মাথাকে ধর্মের নামে বা ধর্মীয় বিধান প্রয়োগ করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ... আমাদের অনেক অগ্রহণযোগ্য বিষয়কে গ্রহণ করতে হয়েছে কারণ সেগুলি ছিল ধর্মীয় বিধানে নির্দেশিত। কোনো মা যখন তাঁর অপারগ শিশুকে ঘুম পাড়াতে চান তখন তিনি তাকে বলেন, 'মুমোও, নয়তো এক বিরাট সিংহ এসে তোমাকে ধরে নেবে।' এটা তাকে চোখ বন্ধ করে থাকতে বাধ্য করে। অনুরূপভাবে, আমরা যখন মাথা তুলে অতীত বর্তমানের দিকে তাকাতে চাই, তখন সমাজ চিৎকার করে বলে, 'ঘুমোও, নয়তো তোমাকে নরকে যেতে হবে।' এর ফলে কথাটা আমাদের বিশ্বাস্য মনে না হলেও আমাদের চুপ করে থাকতে হয়। ... ধর্মের অন্তনিহিত অর্থ বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু ধর্মের সামাজিক বিধানগুলি নিয়ে আলোচনা করব, তাই ধার্মিক মানুষদের ভয় পাবার কিছু নেই...।

পুষদের নির্দেশমতো নারীদের চলতে হবে ভগবানের এই আদেশ কেন আমেরিকা বা উত্তর মে থেকে দক্ষিণ মে পর্যন্ত অন্য কোনো দেশে ঘোষিত হয় নি? ভগবান কি তা হলে শুধু এশিয়ারই ভগবান? আমেরিকা কি তাঁর এলাকার বাইরে? ...সে যা-ই হোক, আমরা আর পুষদের মাতববরি যা ধর্মের নামে আরোপিত সহ্য করতে পারি না। এটা সত্যি যে নারীদের সবচেয়ে বেশি নিপীড়ন সহ্য করতে হয় সেসব স্থানে সেখান ধর্মের রাশ কঠোর। ... যেখানে এ রাশ শিথিল, সেখানে নারীরা পুষদের প্রায় সমকক্ষ। ধর্ম বলতে এখানে বুঝতে হবে ধর্মভিত্তিক সামাজিক বিধান।

কেউ বলতে পারেন 'আপনি ধর্ম নিয়ে কেন আলোচনা করছেন যখন কথা বলছেন সামাজিক সমস্যা নিয়ে?' উত্তর হল ধর্ম আমাদের দাসত্বের বাঁধনকে শক্ত করেছে। পুষরা নারীদের উপর খবরদারি করছে ধর্মের নাম নিয়ে। এ - কারণেই আমাদের আলোচনায় ধর্ম এসে পড়ে। আশা করি ধার্মিক মানুষরা আমাকে মার্জনা করবেন।২৯

তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রোকেয়া তাই ছিলেন বৈপ্লবিক নারী। দেলওয়ার হোসেনের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে নাগরিক বিধান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মের প্রভাব থেকে বাইরে রাখতে হবে।

যে হীনমন্যতা থেকে নারীরা ভুগতেন বেগম রোকেয়া ছিলেন তারও সমালোচক। মহিলাদের গয়নাগাঁটি নিয় অত্যধিক হ্য

াংলামির তিনি বিরোধী ছিলেন। রোকেয়ার মতে গয়নাগাঁটি ছিল দাসত্বের প্রতীক। তাঁর সময়ে বহুল প্রচলিত পর্দা প্রথারও তিনি ছিলেন সমান সমালোচক। সমাজিক প্রগতির এক প্রধান অন্তরায় বলে তিনি একে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই অশুভ প্রথা মুসলিম জনসমষ্টির প্রায় অর্ধভাগকে সকল উৎপাদন ক্রিয়া থেকে দূরে রেখেছে।

বেগম রোকেয়া ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার প্রবল সমর্থক। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষা মহিলাদের আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করবে এবং তাদের মুক্তির সহায়ক হবে। বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের এক অনুজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেন এবং এই বলে পরিতাপ করেন যে যদিও ইসলামের পয়গম্বর পুষ ও নারী উভয় সমাজকেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, মুসলিমরা তার অনেকটাই উপেক্ষা করছে। তাঁর প্রশ্ন ঃ

যে মুসলিমরা পয়গম্বরের প্রতি (বা এক প্রাচীন মসজিদের ইষ্টক খণ্ডের প্রতি) অসম্মান হয়েছে বিবেচনা করলে প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা কেন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর নির্দেশ পালনে অপারগ?৩০

বেগম রোকেয়া নারীদের আর্থিক স্বাধীনতার উপরও জোর দিয়েছেন। মোতিচূর নামক তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে তিনি সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ঃ

পুষদের সমকক্ষ হওয়ার জন্য যা কিছু করা উচিত আমরা তা করব। যদি স্বতন্ত্রভাবে জীবিকার্জন আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে, তবে আমরা তা-ই করব। দরকার হলে আমরা মহিলা করণিক, মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহিলা ব্যারিস্টার, মহিলা বিচারক --- এমন সব কিছু হব। ...সরকারি অফিসে যদি আমাদের চাকরি না জোটে তা হলে আমরা চাষবাস করব। আপনাদের কন্যার জন্য পাত্র না পেলে আপনারা কাঁদতে বসেন কেন?' কন্যাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কন এবং নিজেদের জীবিকার্জন করতে দিন।৩১

১৯০৪ থেকে ১৯৩০ -এর মধ্যে বেগম রোকেয়া নারীদের সমস্যা নিয়ে অনেকগুলি বই ও প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বোধ হয় এশিয়াতে নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯২০-র দশকে মুখ্যত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী বুদ্ধিমুক্তির এক আন্দোলনশু করেন। উনিশ শতকের মুসলিম অগ্রণীদের --- বিশেষত সয়ীদ আহ্‌মদ খান, সৈয়দ আমীর আলি ও দেলওয়ার হোসেনের আধুনিকীকরণের সংস্কারমূলক ও র‍্যাডিক্যাল ভাবধারা এ আন্দোলনে প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছে। অনেক পরে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পর, পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁসের শামিল হন যা ইহবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট জুটিয়েছে; এরই পরিণতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মৌলবাদী ও জঙ্গী ইসলামের অভ্যুত্থান বাঙালি মুসলিমদের যুগ-পুরাতন সহিষ্ণু, সমন্বয়বাদী ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আঘাত হিসাবে দেখা দিয়েছে। ইতিহাস বলে যে ঐস্লামিক মৌলবাদ শুধু তখনই গুত্ব পায় যখনকিছু কায়েমি স্বার্থ--- মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে শুধু নয়, বাইরের কিছু অংশ থেকেও--- পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন পায়। উনিশ শতকেব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ছিল মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল অংশের পৃষ্ঠপোষণ। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ শতকেও কংগ্রেসের ব্রিটিশ - বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশদের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক শান্তিকে বিঘ্নিত করে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্রভাব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের ঐস্লামিক সামরিক জমানাকে সমর্থন করা। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে মদত জুগিয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে এই আশঙ্কায় যে স্বাধীন বাংলাদেশ সোভিয়েত গোষ্ঠীতে যোগ দেবে।

তার জন্মকাল থেকেই বাংলাদেশকে ভেতর বাইরে দুদিক থেকেই শত্রু মোকাবেলা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের কিছু লোকছিল পাকিস্তানের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল অবিচল। তারা বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। এরা পাকিস্তান, সৌদি আরব ও অন্য কয়েকটি দেশ থেকে সমর্থন পেয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি অংশ যা পাকিস্তানপন্থী ও ভারতবিরোধী মনোভাব পোষণ করত তারাও এদের সমর্থন করেছে। ১৯৭৫ -এর সেনাবাহিনীর 'ক্যু দে-তা' যা বাংলাদেশের স্থাপয়িতা মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের নৃশংস হত্যার রূপ নেয় এবং আওয়ামি লীগের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পতন ঘটায় সেটা ছিল এসব লোকদের ষড়যন্ত্রের ফল। ক্ষমতা দখলের অল্প পরেই নতুন

সামরিক শাসকরা নিজেদের আসন শক্ত করার মানসে যে নীতি গ্রহণ করে তাকে ইসলামমুখী ও পাকিস্তানমুখী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যদিও অসামরিক শাসন বাংলাদেশে ফিরে এসেছে প্রায় দুই দশকের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পর, তবু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ রূপটি ফিরে আসে নি বা আসতে পারেনি। রক্ষণশীল ঐস্লামিক গোষ্ঠীরা বাংলাদেশী সমাজ ও প্রশাসনের উপর তাদের দখল শক্ত রেখেছে বলে মনে হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ঐতিহ্যবাহী ও পুনর্জ্জীবনবাদী অংশগুলি মুসলিম সমাজের রেনেসাঁস বা আধুনিকীকরণের শক্তিগুলির সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। বস্তুত সর্বত্রই মুসলিম সমাজ সর্বদাই অতীত ও বর্তমান এই দুই বিপরীত দিক থেকে আকর্ষণের কারণে উভয় সঙ্কটে পড়েছে। মুসলিম সমাজকে তুলনা করা যায় প্রাচীন রোমান দেবতা জোনাস - এর সঙ্গে যাঁর এক মুখ তাকিয়ে আছে সমুখ পানে, অন্য মুখ পেছন দিকে। একটি অতীদের দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে, অন্যটি বর্তমানের আহ্বানে সাড়া দিতে চায়।



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com